بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ অক্টোবর, ২০২৪ মোতাবেক ০৪ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকাল খুতবাতে আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করা হচ্ছে। **আহযাবের যুদ্ধের আরো বিশদ বিবরণ** এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মুশরিকরা যখন পরিখা অতিক্রম করা সত্ত্বেও কোনো সফলতা লাভ করতে পারেনি, বরং চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা সবাই মিলে প্রভাতে আক্রমণ করবে আর কেউ পেছনে থাকবে না। সারারাত তারা প্রস্তুতি নিতে থাকে। আর সূর্যোদয়ের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সামনে পরিখার প্রান্তে চলে আসে। মুশরিকরা সকল দিক থেকে পরিখা ঘেরাও করে ফেলে। আর একটি সেনাদল মহানবী (সা.)-এর তাঁবুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সেই দলে খালিদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন। বার বার পরিখা পার হবার চেষ্টা করার পাশাপাশি মুষলধারে তির নিক্ষেপের মোকাবিলা হয়। কাফিররা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ অসর্তকতার অপেক্ষায় থাকে যে, কোথাও সুযোগ পেলেই তারা পরিখা অতিক্রম করবে। আর এসব আক্রমণ ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা নিয়মিত বিরতিতে চলতে থাকে। সেই সময়ই ওয়াহশী বিন হারব, তোফায়েল বিন নো'মান (রা.)-কে, আবার কারো কারো মতে তোফায়েল বিন মালেক বিন নো'মান আনসারী (রা.)-কে নিজের ছোট্টো বর্শার আঘাতে শহীদ করে দেয়। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র শরীরেও একটি তির বিদ্ধ হয়, যাতে তিনি আহত হন। আর এই আঘাতের কারণেই কিছুদিন পর তাঁর শাহাদত হয়। **(সুবুলুল্ হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত), (সীরাত এনসাইক্লোপিডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫, দ্বারুল্ ইসলাম থেকে প্রকাশিত)**

আর এটিই সেই দিন ছিল যেদিন মুসলমানদের জন্য নামায পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় আদায় করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের লাগাতার ব্যস্ততা এবং উপর্যুপরি আক্রমণের কারণে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে মনে হয়, পরবর্তীকালের রেওয়ায়েতকারীরাও এই কথাগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন নি। আর কিছুকাল পর মূল বিষয় এটি হয়ে যায় যে, সেদিন মহানবী (সা.)সহ মুসলমানরা যোহরের নামাযও পড়তে পারেন নি আর আসরের নামাযও আদায় করতে পারেন নি, অথচ সূর্যাস্ত হয়ে যায়। আর এই নামাযগুলো সূর্যাস্তের পর পড়া হয়। সাধারণত এটি একটি গল্প হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

কতিপয় ঐতিহাসিক তো অতিরঞ্জন করে একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা অস্তমিত সূর্যকে ফেরত পাঠিয়ে দেন; যেন মুসলমানরা যোহর ও আসরের নামায আদায় করতে পারেন। অথচ বাস্তবে এমনটি হয়নি। **এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই দিনটি অত্যন্ত কঠিন একটি দিন ছিল। মহানবী (সা.)সহ সকল মুসলমান উপর্যুপরি আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে ছিলেন। কিন্তু এমনও নয় যে, তারা সবাই, আর বিশেষত মহানবী (সা.) কোনো নামাযই পড়তে পারেন নি।** যদিও কঠিন দিন ছিল, কিন্তু এমন

নয় যে, কোনো নামাযই পড়তে পারেন নি। **সেদিন নামায আদায় করেছেন ঠিকই কিন্তু এক চলমান ভীতি ও বিপদের অবস্থায় এই নামাযগুলো আদায় করা হয়েছে। আর সম্ভবত আসরের সময় আক্রমণগুলো এত জোরালো হয়েছিল যে, আসরের নামায আদায় করার ক্ষেত্রে হয়ত সমস্যা হয়ে থাকবে আর তা ক্রান্তিকালে পড়া হয়ে থাকবে।**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"একথা সঠিক নয় যে, এদিন মুসলমানদের কোনো নামাযই সময়মতো আদায় করা সম্ভব হয়নি। (অর্থাৎ, এই যে বলা হয়, নামায পড়া সম্ভব হয়নি–) একথা সঠিক নয়। বরং যেমনটি সহীহ্ রেওয়ায়েত থেকে সাব্যস্ত হয় যে, ঘটনা কেবল এটি হয়েছিল যে, তখন পর্যন্ত যেহেতু 'সালাতুল খওফ' বা ভীতিপূর্ণ সময়ের নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়নি তাই উপর্যুপরি আশঙ্কা এবং ব্যস্ততার কারণে শুধু একবেলার নামায অর্থাৎ আসরের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, যা মাগরিবের সাথে যুক্ত করে পড়া হয়েছিল। আর কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেবল যোহর ও আসরের নামায অসময়ে আদায় করা হয়েছিল।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) গ্রন্থ, পৃঃ ৫৮৮}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"একদিন আক্রমণ এত জোরালো ও তীব্র হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের কয়েকবেলার নামায সময়মতো পড়া সম্ভব হয়নি। এতে মহানবী (সা.) এতটাই কষ্ট পান যে, তিনি বলেন, খোদা তা'লা কাফিরদের শাস্তি দিন, তারা আমাদের নামায নষ্ট করেছে।... এতে মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্রের একটি দিক বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। আর জানা যায়, পৃথিবীতে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল খোদার ইবাদত করা। যখন শত্রুরা চতুর্দিক থেকে মদীনাকে ঘিরে রেখেছিল। যখন মদীনার পুরুষরা তো দূরে থাক, তাদের নারী এবং শিশুদের প্রাণও বিপদের মধ্যে ছিল। যখন প্রতিটি ক্ষণে মদীনাবাসীর হৃদয় কেঁপে উঠছিল যে, শত্রুরা কোনো দিক দিয়ে আবার মদীনার ভেতরে না প্রবেশ করে বসে। তখনও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাসনা এটিই ছিল যে, খোদা তা'লার ইবাদত যেন নির্দিষ্ট সময়ে উত্তমভাবে পালন করা যায়। (অর্থাৎ, চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থায়ও তাঁর চাওয়া কেবল এটিই ছিল, কোথাও ইবাদত যেন নষ্ট না হয়ে যায়।) মুসলমানদের ইবাদত– ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং হিন্দুদের ন্যায় সপ্তাহে কেবল কোনো একদিন হয় না, বরং মুসলমানদের ইবাদত দিনে ও রাতে পাঁচবার হয়ে থাকে। এমন বিপজ্জনক সময়ে তো দিনে একবারও নামায পড়া মানুষের জন্য কঠিন, সেখানে পাঁচবার আর তা-ও উত্তমরূপে বাজামা'ত নামায আদায় করা কতটা কঠিন হবে! কিন্তু **এই বিপদসঙ্কুল দিনগুলোতেও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই পাঁচবেলার নামাযই যথাসময়ে আদায় করতেন। আর যদি একদিন শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে তিনি তাঁর প্রভুর নাম নিশ্চিন্তে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আর যথাসময়ে না নিতে পারতেন তাহলে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পেতেন।"** (দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪)

এই যুগের হাকাম ও আদাল (তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব রেওয়ায়েতকে, যাতে এই নামাযগুলো রাতের বেলা

(একত্রে) পড়ার উল্লেখ রয়েছে, দুর্বল আখ্যা দিয়ে কেবল একটি রেওয়ায়েতকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন যাতে আসরের নামায নির্দিষ্ট সময়ের পরে পড়ার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, পরিখার যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চারবেলার নামায কাযা করে পড়ার ওপর একজন পাদ্রীর আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "বাকি রইলো এটি যে, পরিখা খননের সময় চারবেলার নামায জমা করে পড়া হয়েছে, এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্ররোচনার উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্মে কাঠিন্য নেই। অর্থাৎ এমন কঠোরতা নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। তাই, তিনি প্রয়োজনের সময় এবং বিপদাপদের সময় নামায জমা করার এবং কসর বা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে চারবেলার নামায জমা করার উল্লেখ নেই। (একথা ঠিক যে, এমনটি হতে পারে, কিন্তু কোথাও কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে উল্লেখ নেই যে, চারবেলার নামায জমা করে পড়া হয়েছে।) বরং সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারী-তে লেখা আছে, **মূল ঘটনা কেবল এটি ছিল যে, এক বেলার নামায অর্থাৎ আসরের নামায নির্ধারিত সময়ের পরে আদায় করা হয়েছে।"**

তিনি (আ.) বলেন, "আপনি যদি এখন আমাদের সামনে থাকতেন তাহলে আমরা আপনাকে একটু বসিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, এটি আপনি কোথায় পেয়েছেন?" {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ বিরোধীকে সম্বোধন করে একথা বলছেন, তুমি আমার সামনে থাকলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম, তুমি এই রেওয়ায়েত কোথা থেকে নিয়েছো?} তিনি (আ.) বলেন, "এটি কি মুত্তাফেক আলাইহে বা সর্বসম্মত রেওয়ায়েত যে, চারবেলার নামায নষ্ট হয়েছিল? শরীয়তের বিধান অনুসারে তো চারবেলার নামায জমা করা যেতে পারে অর্থাৎ, যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা। তবে, একটি দুর্বল রেওয়ায়েতে আছে, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে আর **কেবলমাত্র এটিই প্রমাণিত হয় যে, আসরের নামায শেষ মুহূর্তে পড়া হয়েছিল।**" **(নূরুল কুরআন, ২য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯০)**

যাহোক, এটি স্পষ্ট যে, সারা দিনের নামায জমা করে (পড়া) হয়নি, বরং সংকীর্ণ সময়ে আসরের নামায পড়া হয়েছিল; (আসরের জন্য) স্বল্প সময় অবশিষ্ট ছিল। আর এ জন্যও মহানবী (সা.)-এর আক্ষেপ ছিল যে, সঠিক পদ্ধতিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে নামায আদায় করা যায় নি। **পরিখার যুদ্ধের বিশদ বিবরণে আরো** লেখা আছে,

খন্দকের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক স্নায়ু বিধ্বংসী যুদ্ধ ছিল। যুদ্ধভীতি ছাড়াও ক্ষুধার (কষ্ট) এবং আবহাওয়াও ছিল চরম বৈরী। কয়েক বেলা করে উপোষ থাকতে হতো। এমন সময় **একটি অদৃশ্য সাহায্য** এভাবে আসে যে, মুসলমানদের একটি সশস্ত্র দল তাদের কোনো এক আত্মীয়কে দাফনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে খাদ্যশস্য বোঝাই বিশটি উট পায়, যেগুলো বনু কুরায়যার পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী হিসেবে মক্কার কুরাইশের কাছে যাচ্ছিল। হুয়ী বিন আখতাবের সুপারিশ এবং বিশেষ প্রচেষ্টায় এই খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করা হচ্ছিল। ছোট্ট একটি লড়াইয়ের পর এসব উট মুসলমানরা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে। পরিখাবাসীরা এই খাদ্যদ্রব্য খায় এবং সেই উটগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি উট জবাই করা হয় আর অবশিষ্টগুলো মুসলমানেরা যুদ্ধশেষে মদীনায় নিয়ে যায়। কুরাইশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান এই সংবাদ জানতে পেরে বলে, হুয়ী কতই না অশুভ

সাব্যস্ত হলো! এখন আমাদের ফেরত যাওয়ার সময় নিজেদের মালপত্র বহনের জন্যও আমাদের কাছে কোনো বাহন নেই। **(সুবুলুল্ হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮২, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)** যেভাবে তারা অবরোধ করে রেখেছিল (এমন) যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এটি বৈধ ছিল। তারা (অর্থাৎ মুসলমানরা) যদি তাদের খাদ্যসামগ্রী দখল করে থাকে তাহলে এটি একেবারে বৈধ ছিল।

মহানবী (সা.)-এর আহযাব (তথা সম্মিলিত বাহিনীর) বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করার উল্লেখও এভাবে পাওয়া যায়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সোম, মঙ্গল ও বুধবার যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আসেন; অতঃপর নিজের গায়ে চাদর পরিধান করেন এবং দাঁড়িয়ে হাত তুলে আহযাবের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খুশির (ঝিলিক) দেখেছি।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন অওফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আহযাবের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন। আবু নুআয়েম (রা.) যুক্ত করেছেন, এতে (তিনি) অতিরিক্ত একথা বলেছেন যে, তিনি (সা.) সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন; এরপর তিনি লোকদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, **"হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর সাথে লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা কোরো না বরং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। যদি শত্রুর সাথে তোমাদের সংঘাত বেঁধে যায় তাহলে ধৈর্য ধারণ কোরো এবং জেনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে।"** অতঃপর বলেন,

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! তুমি সৈন্যদলকে পরাস্ত করো। হে আমার আল্লাহ্! তাদেরকে পরাভূত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।**

এক রেওয়ায়েতে এই দোয়াও বর্ণিত হয়েছে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّٰهُمَّ إِنْ تَشَاءْ لَمْ تُعْبَدْ

অর্থাৎ, **'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তাহলে তোমার এই ইবাদত আর করা হবে না'।**

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে, অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমাদের পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া আছে কি? অথবা এমন কোনো দোয়া শেখান যা আমরা করতে পারি। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তোমরা বলো,

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا

অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! আমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে দাও এবং আমাদের ভয়ভীতি দূর করে দাও।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও বর্ণনা করেছেন, "কতিপয় মুসলমান বিচলিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পরিস্থিতি

খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে গেছে। বাহ্যত এখন মদীনার রক্ষা পাবার আর কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। আপনি এখন বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করুন আর আমাদেরকেও এমন কোনো দোয়া শিখিয়ে দিন যা পাঠ করলে আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হবে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করো, তিনি যেন তোমাদের সকল দুর্বলতা ঢেকে রাখেন এবং তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করেন আর তোমাদের উৎকণ্ঠা দূর করে দেন। এরপর তিনি (সা.) নিজেও এভাবে দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

আর একইভাবে এই দোয়াও করেন,

يَا صَرِيْخَ الْمَكْرُوْبِيْنَ يَا مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ اكْشِفْ هَمِّيْ وَغَمِّيْ وَكَرْبِيْ فَاِنَّكَ تَرٰى مَا نَزَلَ بِيْ وَ بِاَصْحَابِيْ۔

অর্থাৎ, **'হে আমার আল্লাহ্! যিনি আমার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করতে পারেন। এই দলটি, যারা সম্মিলিতভাবে এসেছে তাদেরকে পরাজিত করো। হে আমার আল্লাহ্! আমি পুনরায় নিবেদন করছি, তুমি তাদেরকে পরাস্ত করো আর আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করো আর তাদের ষড়যন্ত্রকে নড়বড়ে করে দাও'**।

উক্ত দোয়ার অনুবাদ হলো, **হে বেদনাক্লিষ্টদের দোয়া শ্রবণকারী! হে উৎকণ্ঠিত লোকদের প্রার্থনার উত্তর প্রদানকারী! আমার কষ্ট, আমার দুশ্চিন্তা এবং আমার উদ্বেগ দূর করে দাও, কেননা আমি এবং আমার সাথীরা যে বিপদাপদের সম্মুখীন সে সম্পর্কে তুমি অবগত'**।" **(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ২৭৫)**

ইতিহাসে লেখা আছে, এভাবে যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল আর মক্কার কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্রগুলো তখন এই দীর্ঘ অবরোধের কারণে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। আর যত দ্রুত সম্ভব কোনো চূড়ান্ত আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে উদ্গ্রীব ছিল। কেননা, রণকৌশলগত দিক দিয়ে যেভাবে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ ছিল আর বনু কুরায়যার মতো তাদের মিত্ররা মদীনার ভেতরে অবস্থান করছিল; এসব বিষয় কাফিরদের প্রত্যাশা ও সাহস বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন তারা সবাই মিলে একযোগে আক্রমণ করে মদীনার প্রত্যেকটি ইট খুলে নিতে চাচ্ছিল। (একদিকে) কাফিরদের নেতা এই কর্মপরিকল্পনা করছিল যে, **'তদবীরে কুনদ বান্দা'** অর্থাৎ বান্দা পরিকল্পনা করে। আর অন্য দিকে আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা কি ছিল? **'তকদীরে কুনদ খান্দা'** অর্থাৎ খোদার নিয়তি (তাদের পরিকল্পনায়) হাসছিল যে, এবার দেখো আমি তোমাদের সাথে কি করতে যাচ্ছি! অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহ্র) কোনো পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় না। এরপর **তকদীর কুনদ খান্দা- অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা এক অদৃশ্য সাহায্যের সূচনা করেন।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেছেন,

"নুয়ায়েম বিন মাসউদ নামে বনু গাতফান গোত্রের শাখা আশজাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তিনি মদীনায় পৌঁছেন। এই ব্যক্তি মনে মনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও কাফিররা তার মুসলমান হবার সংবাদ জানতো না।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে কাফিরদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

সর্বপ্রথম নুয়ায়েম বিন মাসঊদ বনু কুরায়যা গোত্রের কাছে যায়, আর তাদের সাথে যেহেতু তার পুরোনো সম্পর্ক ছিল। তাই সে তাদের গোত্র প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, আমার মনে হয় তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তিভঙ্গ করে কুরাইশ ও গাতফানদের সাথে যোগ দিয়ে কাজটি ভালো করো নি। কুরাইশ ও গাতফান তো এখানে মদীনায় কয়েকদিনের অতিথিমাত্র কিন্তু তোমাদের তো এখানেই থাকতে হবে। কেননা, এটিই তোমাদের দেশ, আর এখানে মুসলমানদের সাথেই তোমাদের ওঠাবসা হবে আর তোমরা একথা স্মরণ রেখো, কুরাইশ প্রমুখরা এখান থেকে যাবার সময় তোমাদের দিকে কোনো খেয়াল রাখবে না এবং তোমাদেরকে এভাবে মুসলমানদের করুণার পাত্র করে ফেলে যাবে। অতএব, তোমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রকে কমপক্ষে এটি বলো, তারা যেন নিজেদের কিছু মানুষ জিম্মিরূপে তোমাদের হাতে তুলে দেয় যার ফলে তোমরা আশ্বস্ত হবে যে, তোমাদের সাথে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না। বনু কুরায়যার নেতারা নুয়ায়েমের একথা বুঝতে পারে এবং তারা কুরাইশের নিকট জিম্মি চাইতে সম্মত হয়, যেন পরবর্তীতে তাদের কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়। অতঃপর নুয়ায়েম বিন মাসঊদ কুরাইশের সর্দারদের কাছে যায় এবং গিয়ে বলে, বনু কুরায়যা ভীতসন্ত্রস্ত– পাছে তোমরা চলে যাবার পর তাদের ওপর আবার বিপদ না এসে পড়ে! এ কারণে তারা তোমাদের এই ঐক্যের বিষয়ে দোদুল্যমান হয়ে পড়ছে এবং এই বাসনা করছে যে, জামানত হিসেবে তোমাদের কাছে কিছু মানুষ জিম্মি হিসেবে চাইবে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে কখনো জিম্মি প্রদান কোরো না; (কেননা) পাছে তারা না আবার তোমাদের সাথে প্রতারণা করে তোমাদের জামানত রাখা লোকদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। একইভাবে সে গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে অনুরূপ কথা বলে। এরপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এমন যোগসূত্র হয় যে, কুরাইশ এবং গাতফান গোত্র প্রথম থেকেই এ প্রস্তাব দিয়ে আসছিল যে, মুসলমানদের ওপর পুনরায় সম্মিলিত আক্রমণ করা হোক আর এই আক্রমণ শহরের চতুর্দিকে একযোগে করা হোক, যেন মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাল্পতার কারণে এটি প্রতিহত করতে না পারে এবং কোনো না কোনো স্থান থেকে সারি ভেঙে যায় আর সারি ভেঙে আক্রমণকারীদের পথ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা বনু কুরায়যাকে বলে পাঠায়, অবরোধ দীর্ঘতর হচ্ছে এবং লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অতএব, আমরা এ প্রস্তাব দিয়েছি যে, সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামীকাল মুসলমানদের ওপর একটি সম্মিলিত আক্রমণ করবে, তাই তোমরাও আগামীকালের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। বনু কুরায়যা, যাদের সাথে পূর্বেই নুয়ায়েম বিন মাসঊদের কথা হয়েছিল– (তারা) এই উত্তর দেয় যে, আগামীকাল তো আমাদের সাবাতের দিন, তাই আমরা অপারগ। আর এমনিতেও আমরা এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পারব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এই নিশ্চয়তা না দিবেন, অর্থাৎ আপনাদের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে আমাদের সাথে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না মর্মে কিছু মানুষ আমাদের হাতে তুলে না দিবেন! বনু কুরায়যার এই উত্তর কুরাইশ ও গাতফান গোত্রকে শোনানো হলে তারা হতবাক হয়ে যায় এবং বলে, আসলেই নুয়ায়েম সত্য বলেছে– বনু কুরায়যা আমাদের সাথে প্রতারণা করতে মুখিয়ে আছে। পক্ষান্তরে বনু কুরায়যা যখন কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের প্রত্যুত্তর শোনে যে, আমরা জিম্মি পাঠাবো না; তোমরা সাহায্য করতে আসতে চাইলে এভাবেই আসো, তখন বনু কুরায়যা বলে, নুয়ায়েম আমাদেরকে সঠিক

পরামর্শ দিয়েছিল যে, কুরাইশ ও গাতফানের নিয়তে গরমিল আছে। আর এভাবে নুয়ায়েমের সুন্দর পরিকল্পনার কারণে কাফিরদের শিবিরে ফাটল ও মতভেদ দেখা দেয়।" উভয়ে পরস্পরের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

"এই হলো নুয়ায়েমের পরিকল্পনার আদ্যোপান্ত– কিন্তু নুয়ায়েমের পরম সার্থকতা হলো, সে এমন স্পর্শকাতর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব এমন কোনো কথা নিজের মুখে উচ্চারণ করেনি যাকে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বর্ণনা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। এছাড়া রণকৌশল হিসেবে কেউ যদি (কোনো কৌশল অবলম্বন করে,) কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিংবা এমন কোনো চাল চালে যার ফলে মানুষ শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে– তাহলে এটি কোনো আপত্তির বিষয় নয়, বরং রণকৌশলের একটি অত্যন্ত উপকারী অংশ, যার মাধ্যমে অত্যাচারী শত্রুকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় রক্তপাতের ধারা বন্ধ করতে অনেক সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।" **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) গ্রন্থ, পৃ: ৫৯১-৫৯৩}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "কিছুদিন পরে উভয় গোত্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, একটি নির্ধারিত সময়ে ইহুদী ও মুশরিকদের সৈন্যবাহিনী অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করবে কিন্তু তখন বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্ তা'লার একটি সাহায্য প্রকাশিত হয় যার বিবরণ হলো, গাতফান গোত্রের নুয়ায়েম নামক এক ব্যক্তি যে মনের দিক থেকে মুসলমান ছিল। এই ব্যক্তিও কাফিরদের সাথে এসেছিল কিন্তু সুযোগ পেলেই মুসলমানদের সাহায্য করার অপেক্ষায় ছিল। একজন মানুষ আর কিইবা করতে পারত, কিন্তু যখন সে দেখে, ইহুদীরাও কাফিরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং বাহ্যত এখন আর মুসলমানদের সুরক্ষার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না, তখন এই অবস্থায় সে এতটা প্রভাবিত হয় যে, সে সিদ্ধান্ত নেয়, এই নৈরাজ্য দূর করতে আমার অবশ্যই কিছু না কিছু করা উচিত। অতএব, উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে যখন একদিন আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে বনু কুরায়যার কাছে যায় এবং তাদের নেতাদের বলে, আরবদের সৈন্যবাহিনী যদি পলায়ন করে তাহলে মুসলমানরা তোমাদের কী দশা করবে– তা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আর চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করার পরিণামে যে শাস্তি তোমরা পাবে তা একবার কল্পনা করো! (এতে) তারা কিছুটা ভয় পায় এবং জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমরা কী করব? নুয়ায়েম বলে, আরবরা যখন তোমাদের কাছে সম্মিলিতভাবে আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তোমরা মুশরিকদের কাছে দাবি করবে, তোমরা তোমাদের সত্তরজন ব্যক্তিকে আমাদের কাছে জামানত হিসেবে প্রেরণ করো। তারা আমাদের দুর্গের সুরক্ষা করবে এবং আমরা মদীনার পশ্চাৎ দিক থেকে এর ওপর (অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর) আক্রমণ করব। অতঃপর সে সেখান থেকে ফিরে এসে মুশরিকদের নেতাদের কাছে যায় এবং তাদেরকে বলে, এই ইহুদীরা তো মদীনার অধিবাসী। চরম মুহূর্তে যদি তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তোমরা কী করবে? এরা যদি মুসলমানদের খুশি করার জন্য এবং নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করানোর জন্য তোমাদের কাছে তোমাদের কিছু মানুষকে জামানত হিসেবে চায় আর তাদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়, সেক্ষেত্রে তোমরা কী করবে? তোমাদের উচিত তাদের পরীক্ষা করে দেখা যে, তারা দৃঢ়পদ আছে নাকি নেই? তাই দ্রুত তাদেরকে তোমাদের সাথে একযোগে আক্রমণ করার আহ্বান জানাও। কাফির সর্দাররা এই পরামর্শকে সঠিক জ্ঞান করে পরের দিনই ইহুদীদেরকে বার্তা পাঠায়, আমরা সম্মিলিতভাবে একটি আক্রমণ করতে চাই, তোমরাও আগামীকাল তোমাদের

সৈন্যসামন্ত–সহ আক্রমণ করো। বনু কুরায়যা বলে, প্রথমত- আগামীকাল আমাদের সাবাতের দিন [আর সাবাতের দিন আমরা আক্রমণ করি না,] তাই আমরা ঐদিন লড়াই করতে পারব না। দ্বিতীয়ত- আমরা মদীনার অধিবাসী আর তোমরা বহিরাগত। তোমরা যদি রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাও তাহলে আমাদের কী হবে? তাই তোমরা আমাদেরকে সত্তরজন ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে প্রদান করলে তবেই আমরা যুদ্ধে অংশ নেব। কাফিরদের হৃদয়ে যেহেতু পূর্বেই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, তাই তারা এই দাবি পূর্ণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে, তোমরা যদি সত্যিই আমাদের সাথে জোট বেঁধে থাকো তাহলে এ ধরনের দাবি উত্থাপনের কোনো অর্থ হয় না। এ ঘটনার ফলে ঐদিকে ইহুদীদের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে, অন্যদিকে কাফিরদের হৃদয়েও সন্দেহ দানা বাঁধে। আর যেমনটি চিরাচরিত রীতি– সন্দেহ একবার হৃদয়ে দানা বাঁধলে বীরত্বের চেতনাও নিঃশেষ হয়ে যায়।" **(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৮০-২৮১)**

অতঃপর **আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এক রাতে প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের আকারে প্রকাশিত হয়,** যে কারণে আহযাব তথা মুশরিকদের আক্রমণকারী বিভিন্ন গোত্র পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে, ইবনে ইসহাক বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রচণ্ড শীতের রাতে এমন প্রবল ধূলিঝড় সৃষ্টি করেন যা কাফিরদের হাড়িপাতিল ওলটপালট করে দেয় এবং তাদের থালাবাসন উড়ে যায়। বালাযুরী লিখেছেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেন। এটি পাণ্ডু বর্ণের ধূলিঝড় ছিল যা তাদের চোখে ঢুকে গিয়েছিল। তাদের মাঝে দুর্বলতা এবং কাপুরুষতা সৃষ্টি করে দেয়। আর মুশরিকরা পিছু হটতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের শিবিরে ফেরত চলে যায়। প্রবল ঝড়োহাওয়া তাদের ওপর বইতে থাকে আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) ফিরিশ্‌তা বাহিনী ঘিরে রাখে। তাদের চোখ ঝলসে দেয় আর তারা ফেরত চলে যায়। **(সুবুলুল্ হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

এর বিশদ বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"হয়ত নুয়ায়েম বিন মাসঊদের এই শান্তিপ্রিয় প্রচেষ্টার পরিণাম বিফলে যেতে পারত এবং সাময়িক পরাজয় এবং পতনের পর কাফিরদের মাঝে পুনরায় ঐক্য এবং স্থিতিশীলতার চেতনা জেগে উঠতে পারত, কিন্তু খোদার পক্ষ থেকে এমন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে যে, সেই ঘটনার পর রাতের বেলা প্রচণ্ড এক ঝড়োহাওয়া শুরু হয় যা কাফিরদের বিশাল সেনা ছাউনি, যেটি একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত ছিল, সেখানে এক ভয়ানক ধূড়িঝড় সৃষ্টি করে দেয়। ছাউনি উপড়ে যায়। তাঁবুগুলোর পর্দা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যায়। হাড়িপাতিলগুলো উল্টে গিয়ে চুলার মধ্যে পতিত হয় আর বালু এবং নুড়ি পাথরের বৃষ্টি মানুষের কান, চোখ এবং নাকে ঢুকে যেতে থাকলো আর সবচেয়ে বড়ো যে ধ্বংসযজ্ঞ হয় (তা হলো) সে-ই জাতীয় আগুন, যা আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাতের বেলা অতি ভক্তিসহকারে প্রজ্জ্বলিত করে রাখা হতো, সেগুলো এদিক সেদিক খড়কুটোর ন্যায় উড়ে গিয়ে নিভে যেতে থাকে। [তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই আগুন কোনোভাবে নির্বাপিত হবে না।] সেই দৃশ্য কাফিরদের ভ্রমগ্রস্ত হৃদয়গুলোকে যা পূর্বেই অবরোধের বেদনাদায়ক দৈর্ঘ্য আর জোটের পারস্পরিক অবিশ্বাসের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নড়বড়ে হচ্ছিল, তাতে এমন এক ধাক্কা লাগে যা তারা আর সামলে উঠতে পারে নি আর প্রভাত উদয়ের পূর্বেই মদীনার দিগন্ত কাফির সেনাদলের ধূলোবালি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল। অতএব, ঘটনা যা ঘটে তা হলো, এই

ধূলিঝড়ের তীব্রতা যখন বৃদ্ধি পায় তখন আবু সুফিয়ান নিজের আশেপাশের কুরাইশ নেতাদের ডেকে বলে, আমাদের সমস্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখন এখানে আর অধিককাল অবস্থান করা সমীচীন হবে না। তাই উত্তম হলো, চলো আমরা ফিরে যাই আর আমি তো যাচ্ছিই। একথা বলে সে নিজের লোকদেরকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয় আর সে নিজের উটে আরোহণ করে কিন্তু তার ভীতিকর যে অবস্থা ছিল তা হলো, সে উটের পায়ের রশি খোলার কথাও ভুলে যায় আর আরোহণ করার পর উট অগ্রসর না হওয়াতে তার মনে পড়ে যে, উটের পায়ের বাঁধন এখনো খোলা হয় নি। সে সময় ইকরামা বিন আবু জাহল, আবু সুফিয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছুটা তিক্ততার সাথে বলে, হে আবু সুফিয়ান! তুমি তো যুদ্ধের সেনাপতি, (তুমি তো সেনাপ্রধান অথচ) সেনাদলকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যাচ্ছ! অন্যদের ব্যাপারে তোমার কোনো চিন্তাও নেই! ফলশ্রুতিতে আবু সুফিয়ান লজ্জিত হয় আর উট থেকে নেমে বলে, ঠিক আছে, আমি এখনই যাচ্ছি না কিন্তু তোমরা দ্রুত প্রস্তুতি নাও আর যতটা দ্রুত সম্ভব এখান থেকে প্রস্থান করো। অতএব, লোকেরা দ্রুত ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকে আর আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ পর নিজের উটে আরোহণ করে ফিরতি যাত্রা শুরু করে। তখনো বনু গাতফান এবং অন্যান্য গোত্রগুলো কুরাইশের এই পলায়ন সম্পর্কে অনবহিত ছিল কিন্তু কুরাইশ শিবির দ্রুততার সাথে যখন খালি হতে শুরু করে তখন অন্যরাও এই সংবাদ পেয়ে যায়, ফলে তারাও বিচলিত হয়ে ফেরত যাত্রার ঘোষণা দেয় আর বনু কুরায়যাও নিজেদের দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং আর বনু কুরায়যার সাথে বনু নযীরের নেতা হুয়ী বিন আখতাবও তাদের দুর্গে চলে যায়, আর এভাবে **প্রভাতের শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই সমস্ত প্রান্তর খালি হয়ে যায় আর ঘটনার আকস্মিক এবং বিস্ময়কর রূপান্তরের মাধ্যমে মুসলমানরা বিজিত হতে হতে বিজয়ী হয়ে যায়**।"{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) গ্রন্থ, পৃ: ৫৯৩-৫৯৪}

কোথায় এই অবস্থা ছিল অর্থাৎ শঙ্কা ছিল পাছে কাফির (মদীনা) দখল করে নেবে কিন্তু এখন অবস্থা হলো, মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে গেল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি লেখেন:

"সংশয় ও সন্দেহের দোলাচালে কাফির সেনাদল রাতের বেলা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নিজেদের শিবিরে চলে যায়। তখন খোদা তা'লা ঐশী সাহায্যের অপর একটি পথ উন্মোচন করেন। রাতে প্রচণ্ড ধূলিঝড় আরম্ভ হয় যা তাবুগুলোর পর্দা ছিড়ে ফেলে। চুলার ওপর থেকে হাড়িপাতিল ফেলে দেয় আর কোনো কোনো গোত্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নিভে যায়। আরবের পৌত্তলিকদের মাঝে একটি রীতি ছিল, তারা সারা রাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতো এবং এটিকে তারা শুভ লক্ষণ বলে মনে করতো। যার আগুন নিভে যেত সে মনে করতো যে, আজকের দিন আমার জন্য অশুভ আর তখন সে নিজের তাঁবু তুলে রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটতো আর যেসব গোত্রের আগুন নিভে যেত তারা এই রীতি অনুসারে নিজেদের তাঁবু গুটিয়ে পেছনে সরে যেত, যাতে এক দিন পশ্চাতে অপেক্ষা করে পুনরায় সেনাদলে যোগদান করতে পারে কিন্তু যেহেতু দিনের বেলা বাক-বিতণ্ডার কারণে দলের নেতাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছিল। যেসব গোত্র পেছনে সরে গিয়েছিল তাদের আশেপাশের গোত্রগুলো মনে করে, হয়ত ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ করেছে এবং আমাদের আশেপাশের গোত্রগুলো পলায়ন করছে। তাই, তারাও দ্রুত নিজেদের তাঁবু গুটাতে আরম্ভ করে এবং রণক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। আবু সুফিয়ান নিজের তাঁবুতে নিশ্চিন্তে

ঘুমিয়ে ছিলো। এই ঘটনার সংবাদ সেও জানতে পারে। তখন সে ভয়ের চোটে নিজের বেঁধে রাখা উটের পিঠে আরোহণ করে এবং সেটিকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। অবশেষে তার বন্ধুরা তার মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, কী বোকামি করছ? অতঃপর তার উটের বাঁধন খোলা হয় এবং নিজের সঙ্গী-সাথীসহ সেও রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যায়।”
(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৮১)

কাফিরদের অবস্থা যখন এমন হয় তখন মহানবী (সা.) মুশরিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-কে প্রেরণ করেন। সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে, সেই রাতেই যখন কাফিররা এভাবে নিজ থেকেই রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন মহানবী (সা.) নিজের আশেপাশের সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি আছে যে এখন গিয়ে শত্রুদের অবস্থা জেনে আসতে পারে? কিন্তু সাহাবীরা বর্ণনা করেন, সেই সময় এত প্রচণ্ড শীত ছিল, এছাড়া ভয়, ক্লান্তি ও ক্ষুধার এমন অবস্থা ছিলো যে, আমাদের মধ্যে থেকে কেউই নিজের ভেতর এই শক্তি পাচ্ছিলো না যে, উত্তরে কিছু বলবে বা নিজের অবস্থান থেকে নড়াচড়া করবে। অবশেষে মহানবী (সা.) নিজেই নাম ধরে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-কে ডাকেন। ফলে তিনি শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠেন আর মহানবী (সা.)-এর সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি (সা.) পরম মমতায় তার মাথায় নিজের হাত বুলিয়ে দেন আর তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, ‘তুমি একেবারেই ভয় পেয়ো না, নিশ্চিন্ত থাকো, ইনশাআল্লাহ্ তোমার কোনো কষ্ট হবে না। তুমি কেবল চুপিসারে কাফিরদের শিবিরে যাও, তবে কারো সাথে কোনো বিতণ্ডা করবে না আর নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করবে না।’ **হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি যখন যাত্রা করি তখন আমি লক্ষ্য করি, আমার শরীরে শীতের কোনো নাম-নিশানাও নেই। [কোথায় এই অবস্থা ছিলো যে, শীতে কাঁপছিলেন, তিনি বলেন, শীতের কোনো নাম-নিশানাও ছিলো না] বরং আমার এমন মনে হচ্ছিলো যে, একটি উষ্ণ গোসলখানার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এবং আমার ভয় ক্রমশ দূর হতে থাকে।** সে সময় নিরেট ঘুটঘুটে রাতের আঁধার ছিল। আমি একেবারে নির্ভয়ে কিন্তু চুপিসারে কাফিরদের ঘাঁটির ভেতরে চলে যাই। তখন আমি দেখি! আবু সুফিয়ান এক স্থানে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছে। আমি তাকে দেখে তৎক্ষণাৎ নিজের তির ধনুকে যুক্ত করি এবং তির প্রায় নিক্ষেপ করবো, ঠিক তখনই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা স্মরণ হয় আর আমি তির নিক্ষেপ করা থেকে বিরত হই। যদি সেই সময় আমি তির নিক্ষেপ করতাম তাহলে আবু সুফিয়ান এতটাই নিকটে ছিলো যে, নিশ্চিত সে মারা যেত। সে সময় আবু সুফিয়ান নিজের সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলো। অতঃপর সে আমার সামনেই উটের ওপর আরোহণ করে কিন্তু ভয়ের চোটে সে তার উটের পায়ের বাঁধন খুলতে ভুলে যায়। এরপর আমি ফেরত চলে আসি।” [তিনি (রা.) বলেন,] আমি যখন নিজেদের শিবিরে পৌঁছাই তখন মহানবী (সা.) নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর নামায শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করি। এরপর তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলি। ফলে **তিনি (সা.) খোদা তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এটি আমাদের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা বাহুবলের পরিণাম নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহের ফলেই (এই বিজয়) লাভ হয়েছে যিনি নিজের ফুৎকারে (এই) শত্রুদলকে পিছু হটিয়ে দিয়েছেন। এরপর কাফিরদের পলায়নের সংবাদ**

দ্রুতই গোটা মুসলমান শিবিরে চাউর হয়ে যায়।” **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) গ্রন্থ, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৫}**

এই ঘটনাটিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “রাতের তৃতীত প্রহরে সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে প্রায় পঁচিশ হাজার কাফির সৈন্য তাঁবু খাঁটিয়ে অবস্থান করছিল, সেটি অরণ্যের ন্যায় বিরাণ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'লা এলহামযোগে মহানবী (সা.)-কে জানান, **তোমার শত্রুদের আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি**। [আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন বলেই তিনি (সা.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, কে আছে যে (দেখে) আসবে?] তিনি (সা.) প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য কাউকে প্রেরণ করতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি নিজের আশেপাশের উপবিষ্ট সাহাবীদের ডাক দেন। তখন শীতকাল ছিল এবং মুসলমানদের কাছে পর্যাপ্ত কাপড়ও ছিল না। শীতের তীব্রতায় জিহ্বাও জড়িয়ে যাচ্ছিল। [কথা বলতে পারছিলেন না।] কয়েকজন সাহাবী বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর আওয়াজ শুনতে পাই এবং আমরা উত্তরও দিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব হচ্ছিল নি। শুধু হুযায়ফা (রা.) ছিলেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কী করতে হবে? [এখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটা বলেন নি যে, তিনি (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে ডেকেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হুযায়ফা (রা.) জিজ্ঞেস করাতে] তিনি (সা.) বলেন, তুমি না, আমার অন্য কাউকে দরকার। এরপর তিনি (সা.) বলেন, কেউ আছো কী? কিন্তু আবারো শীতের তীব্রতার কারণে যারা জেগে ছিলেন তারা উত্তর দিতে পারেন নি। হুযায়ফা (রা.) পুনরায় বলেন, আমি উপস্থিত আছি আল্লাহ্র রসূল (সা.)! পরিশেষে তিনি (সা.) হুযায়ফা (রা.)-কে একথা বলে পাঠান যে, ‘আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, ‘আমি তোমার শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছি’। শত্রুদের কী অবস্থা দেখে তা আসো। হুযায়ফা (রা.) পরিখার নিকটে যান এবং রণক্ষেত্র শত্রু সৈন্য থেকে সম্পূর্ণ খালি দেখতে পান। তিনি ফেরত আসেন এবং কলেমা শাহাদত পাঠ করে মহানবী (সা.)-এর রিসালতের সত্যায়ন করেন এবং বলেন, শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছে।” **(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৮১-২৮২)**

অবশিষ্ট বিশদ বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করবো।

যেমনটি আপনারা জানেন, পৃথিবীর অবস্থা প্রতিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য পরাশক্তিগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করছে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের এবং নিরপরাধদের এর ভয়ানক কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন। এজন্য আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো নিবিড় করতে হবে এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এদিকে প্রত্যেক আহমদীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। পাকিস্তানের আহমদীদের অবস্থাও অনেক বেশি অবনতি হচ্ছে, তাদের জন্যও দোয়া করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের অবস্থার উন্নতির জন্যও দোয়া করুন। তাদের ওপরও অনেক নির্যাতন হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি দয়া ও কৃপা করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৪, পৃঃ ২-৬)